সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ (ইউসিআরসি) গঠনের প্রেক্ষাপট

সর্বব্যাপী প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়ে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলেন পূর্ববাংলা থেকে আসা ছিন্নমূল মানুষ। বাংলার বাইরে বসতি স্থাপনের চেষ্টাও প্রতিপদে বাধার সম্মুখীন হচ্ছিল। যেমন ৬ মে, ১৯৫০-এ আসামের গোয়ালপাড়া জেলার শাসক এক ইস্তাহার দিয়ে জানান যে, সাম্প্রতিক ভারত-পাকিস্তান চুক্তি কার্যে পরিণত হওয়ায় পূর্ববঙ্গ থেকে আগত আশ্রয় প্রার্থীদের নিজ নিজ স্থানে ফিরে যাওয়া উচিত, ... আসামে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতির জন্য যথেষ্ট পরিমাণ জমি নেই।[৩]

এরই মাঝে উদ্বাস্তুরা বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে প্রতিরোধ আন্দোলন সংগঠিত করছিলেন। সরকারের অনিচ্ছুক হাত থেকে দাবি আদায়ের সংগ্রাম কলোনিগুলি রক্ষা এবং বাইরে যে-সব উদ্বাস্তুদের পাঠানো হয়েছে তাদের সংগ্রাম ইত্যাদিকে এক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ছত্রছায়ায় সংগঠিত করার তাগিদে উদ্বাস্তুদের সংগ্রামী সংগঠন সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ (ইউসিআরসি)-র জন্ম হয়। ইউসিআরসি গঠনে যে-সব সংগঠন উদ্যোগ নিয়েছিল তার মধ্যে প্রধান ছিল— নিখিলবঙ্গ বাস্তুহারা কর্ম পরিষদ, দক্ষিণ কলিকাতা শহরতলি বাস্তুহারা সমিতি, উত্তর কলিকাতা বাস্তুহারা সমিতি, সাড়ে তিনশত বাস্তুহারা ক্যাম্প, কলোনি কমিটিগুলি-সহ বিভিন্ন বামপন্থী রাজনৈতিক দল, সেবা প্রতিষ্ঠান, গণতান্ত্রিক শক্তি। এই সংগঠনগুলির প্রতিনিধিরা ছাড়াও কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া, ফরওয়ার্ড ব্লক, মার্কসিস্ট ফরওয়ার্ড ব্লক, সোসালিস্ট ইউনিটি সেন্টার, আর সিপিআই, ডেমোক্রেটিক ভ্যানগার্ড, বলশেভিক পার্টি, সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান পার্টি প্রভৃতি দলগুলির ১ জন করে প্রতিনিধি নিয়ে ইউসিআরসি গঠিত হয়েছিল।

সরকারের মুখাপেক্ষী না হয়ে রিক্ত, সর্বহারা, স্বদেশ ও স্বজনহারা উদ্বাস্তুরা সরকারি ঔদাসীন্যে ও হয়রানিতে জেরবার হওয়ার হাত থেকে রেহাই পেতে ও বাঁচার তাগিদে খালি বাড়ি, মুসলিম পরিত্যক্ত গৃহ ও জমি, পতিত জমি, জলা জমি দখল শুরু করেন। তাঁরা কলোনি গড়ে তোলেন। এই জবরদখল কলোনি সৃষ্টি ভারতের ইতিহাসে এক সম্পূর্ণ নতুন বিষয়। এই কলোনিগুলির সৃষ্টির পেছনে রয়েছে উদ্বাস্তুদের নিরন্তর লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে বাঁচার সংগ্রাম ও ইতিহাস। এই সংগ্রামকে সার্থক সংগঠিত রূপ দিয়েছে ইউসিআরসি। শুরু হয় সংগ্রামের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। পশ্চিমবঙ্গের জাগ্রত জনগণ, গণতান্ত্রিক শক্তি সর্বদাই উদ্বাস্তুদের ন্যায্য দাবি নিয়ে আন্দোলনে এগিয়ে এসেছেন। সরকারি মুখের দিকে না তাকিয়ে সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রচেষ্টায় একের পর এক জবরদখল কলোনিগুলির সৃষ্টি হতে থাকে। নিখিলবঙ্গ বাস্তুহারা পরিষদ এই কলোনি গঠনে প্রথম নেতৃত্ব দেন। প্রায় একই সঙ্গে দক্ষিণ কলকাতা শহরতলি বাস্তুহারা সংহতি ও অন্যান্য উদ্বাস্তু সংগঠনের নেতৃত্বে জবরদখল কলোনিগুলি গড়ে উঠতে থাকে। যাদবপুর-টালিগঞ্জে, হালতু, ঢাকুরিয়া, গড়িয়া, টালিনালার পাড়ে, বেহালা প্রভৃতি বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে জমিদাররা ফাটকাবাজির উদ্দেশ্যে যে-সব জমি পতিত রেখেছিলেন তাতে দক্ষিণ কলকাতা শহরতলি বাস্তুহারা সংহতির নেতৃত্বে উদ্বাস্তু কলোনিগুলি গড়ে ওঠে। উদ্বাস্তুরা কলোনি প্রতিষ্ঠা করেই পশ্চিমবঙ্গের ছোটো লাট (বর্তমানে রাজ্যপাল) ডা. কৈলাসনাথ কাটজু, মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের নিকট 'মেমোরেন্ডাম' পাঠাতেন। পুলিশ ও জমিদারের গুন্ডারা কলোনিগুলি বারে বারে ভেঙে দেয়, কিন্তু রাতারাতি তা আবার পুনর্নির্মিত হয়।[৪]

দক্ষিণ কলকাতা শহরতলির উদ্বাস্তুরা এই আক্রমণ রোখার জন্য ঐক্যবদ্ধ হন এবং ২৮ মে, ১৯৫০ নেতাজি নগরে এক কনভেনশনে মিলিত হয়ে দক্ষিণ কলকাতা শহরতলি বাস্তুহারা সংহতি গঠন করেন। ২১ জনকে নিয়ে একটি কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়েছিল। সম্মেলনের প্রধান আওয়াজ ছিল "সর্বপ্রকার দলমত নির্বিশেষে বাস্তুহারা ঐক্য গড়ে তুলুন।"

২৯ মে, ১৯৫০ নিখিলবঙ্গ বাস্তুহারা কর্ম পরিষদের উদ্যোগে নৈহাটি বিজয় নগর উদ্বাস্তু উপনিবেশের আনন্দবাজারের সুবিশাল প্রাঙ্গণে বিশাল বাস্তুহারা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ধুবুলিয়া, কৃষ্ণনগর, কাঁচড়াপাড়া, দমদম প্রভৃতি উদ্বাস্তু শিবির এবং উদ্বাস্তু উপনিবেশের প্রতিনিধিরা সম্মেলনে যোগ দেন। প্রায় দুই হাজার উদ্বাস্তু সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

প্রস্তাবে বলা হয় উদ্বাস্তুদের ভারতের স্থায়ী নাগরিক রূপে স্বীকার করতে হবে, তাদের নাগরিক অধিকার ও ভোটাধিকার প্রদান করতে হবে, উদ্বাস্তুদের দখলীকৃত জমিগুলিকে রিকুইজিশন করতে হবে ইত্যাদি এবং সমস্ত স্তরের বাস্তুহারাদের নিয়ে সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়।

একটি কেন্দ্রীয় উদ্বাস্তু সংগঠন গড়ার জন্য ৪ জুন, ১৯৫০ তেতাল্লিশটা উদ্বাস্তু সংগঠন, বিভিন্ন কলোনির ২০০ জন প্রতিনিধি কমার্শিয়াল মিউজিয়াম হলে সমবেত হন। সেখানে সিদ্ধান্ত হয় আগামী ১১, ১২ ও ১৩ আগস্ট ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে কেন্দ্রীয় সংগঠন গড়ার জন্য সম্মেলন আহ্বান করা হবে। সেজন্য সত্যপ্রিয় ব্যানার্জিকে সভাপতি ও প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী অম্বিকা চক্রবর্তীকে সম্পাদক করে একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব হিসেবে কৃষ্ণবিনোদ রায়, বঙ্কিম মুখার্জি প্রমুখ উদ্বাস্তুদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

ইউসিআরসি-র জন্মলগ্নে যে ইস্তাহারটি ছাপা হয়েছিল তাতে প্রাদেশিক সংযুক্ত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা সম্মেলনকে সফল করার জন্য এই আহ্বান জানানো হয়েছিল—

"বন্ধুগণ,

খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং সর্বাঙ্গীণ পুনর্বাসনের দাবি আদায়ের জন্য দলে দলে সম্মেলনে যোগ দিন।

১২ আগস্ট বেলা ৪ ঘটিকায় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে প্রতিনিধি সম্মেলন।

১৩ আগস্ট বেলা ২ ঘটিকায় মনুমেন্টের নীচে ময়দানে প্রকাশ্য অধিবেশন।

বিভিন্ন বাস্তুহারা সংগঠন ও শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, ছাত্রী, মহিলা, কর্মচারী ও যুব সংঘ প্রভৃতি তিন শতাধিক প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান এবং বহু বিশিষ্ট প্রগতিশীল নেতা সম্মেলনে যোগদান করছেন।

ভাইসব, বাস্তুহারা সমস্যা বর্তমানে বাংলার তথা সমগ্র ভারতের জাতীয় জীবনের প্রথম ও প্রধান সমস্যা। সাম্রাজ্যবাদ ও তাঁর তাঁবেদার প্রতিক্রিয়াশীল ধনিক শ্রেণির চক্রান্তের ফলে লক্ষ লক্ষ লোক আজ অপমৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতেছে। ইহার ফলে বাংলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সমাজ জীবন আজ বিপন্ন, বাংলার কৃষ্টি, সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিলুপ্ত প্রায়। সরকারের চরম ঔদাসীন্য ও বাস্তুহারাদের মধ্যে সংঘবদ্ধতার অভাব এবং উভয়ের সুযোগে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহ সর্বপ্রকার বাস্তুহারাদের সর্বনাশ ঘটাইতে সমুদ্যত হইয়া উঠিয়াছে। বাস্তুহারাদের বিরুদ্ধে এই দেশব্যাপী ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করিবার জন্য ও লৌহ কঠিন ঐক্যবদ্ধ সংগঠনের ভিত্তিতে বাস্তুহারাদের দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে তীব্র আন্দোলন সৃষ্টির জন্য দলে দলে আসন্ন সম্মেলনে যোগদান করুন। ১১৫/এ, আমহার্স্ট স্ট্রিটে সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির সম্পাদকের নিকট প্রতিটি এলাকা, প্রতিটি উদ্বাস্তু শিবির ও উপনিবেশ হইতে নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দের নাম ও যথাশক্তি আর্থিক সাহায্য পাঠাইয়া উদ্বাস্তু পুনর্বসতির আন্দোলনকে জয়যুক্ত করুন।

- বাস্তুহারা ঐক্য জিন্দাবাদ।
- পুনর্বসতির ব্যবস্থা চাই।
- বাস্তুহারা স্বার্থবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল ধনিক শ্রেণির চক্রান্ত ধ্বংস হউক।
- বাস্তুহারা আন্দোলন সংক্রান্ত সমস্ত বন্দীর মুক্তি চাই।
- বাস্তুহারা উচ্ছেদ বন্ধ কর।
- সরকারি জুলুম ও ঔদাসীন্য চলিবে না।”[৫]

প্রথম সংযুক্ত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা প্রাদেশিক সম্মেলন

এই সম্মেলনে ৮০০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত হয়েছিলেন। উল্লেখযোগ্য, মুসলমান বাস্তুহারাদের প্রতিনিধিরাও যোগ দিয়েছিলেন। সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি ও অম্বিকা চক্রবর্তী সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন। বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃত্ব সহ-সভাপতি ও সহ-সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন। সম্মেলনে ডেমোক্র্যাটিক ভ্যানগার্ড পার্টির নেতা জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়ের পরামর্শে সংগঠনের নাম সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ রাখা হয়। ১৩ আগস্ট, ১৯৫০ রবিবার দিন বিকেলে কলকাতায় গড়ের মাঠে মনুমেন্টের পাদদেশে লক্ষাধিক উদ্বাস্তুদের এক বিশাল সমাবেশ হয়। সভাপতিত্ব করেন বিখ্যাত শ্রমিক নেতা মৃণালকান্তি বসু। উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার।

ইউসিআরসি-র প্রথম সম্মেলনের সাফল্যে চারিদিকের উপেক্ষিত, নির্যাতিত উদ্বাস্তুদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগে। সম্মেলনে ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৫০ দিবসটিকে সারা পশ্চিমবাংলার বাস্তুহারা ঐক্য দিবস পালনের আহ্বান পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত শিবিরে ও কলোনিতে উৎসাহের সঙ্গে পালিত হয়। উদ্বাস্তু আন্দোলনে নতুন জোয়ার আসে। বামপন্থী আন্দোলনও তাতে পুষ্ট হয়। বাংলার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের পথ নির্দেশক হিসাবে সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদকে বলা যায়।

২৬ নভেম্বর ১৯৫০ বাস্তুহারা পরিষদের ৫নং সার্কুলারে বলা হয়, ‘আমাদের ইহা স্মরণ রাখতে হইবে যে, কলোনি স্বীকারের দাবি ও বাস্তুহারাদের বাস্তুর দাবির আন্দোলন আমাদের দেশের মূল আন্দোলনগুলি হইতে সম্পর্কচ্যুত নহে— ইহা সাম্রাজ্যবাদ— সামন্ততন্ত্রী বিরোধী মূল আন্দোলনের পরিপূরক।’ সার্কুলারে বৃহত্তর জনসমাজের সাথে বাস্তুহারা মানুষের ঐক্য গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়। ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৫০ নিখিলবঙ্গ বাস্তুহারা কর্ম পরিষদ তার সংগ্রামী মেজাজ ও ঐতিহ্য নিয়ে ইউসিআরসি-র মধ্যে মিশে যায়। ২৩ ডিসেম্বর মুসলিম ইউস্টিটিউট হলে বাস্তুহারা কর্মপরিষদের প্রতিনিধিরা মিলিত হয়ে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই সিদ্ধান্ত বাস্তুহারা নেতা মহাদেব ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে শ্রদ্ধানন্দ পার্কের প্রকাশ্য সভায় ঘোষণা করা হয়। এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্য বিজয় মজুমদার ও ননী করকে যুগ্ম সম্পাদক করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। মুসলিম ইনস্টিটিউটের সভায় সদ্য কারামুক্ত জ্যোতি বসু এই সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। এই সম্মেলনের খবর পেয়ে বাংলার বাইরের উদ্বাস্তুদের মধ্যে বিপুল সাড়া ও আশা জাগে। বিহার থেকে বাস্তুহারারা চিঠি দিয়ে এই আন্দোলনকে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বাইরেও ছড়িয়ে দেবার অনুরোধ জানান।

ইউসিআরসি-র নেতৃত্বে উদ্বাস্তু আন্দোলনের ধারা

পাঁচের দশক

১৯৫১ সালের এভিকশন অ্যাক্ট (ACT XVI 1951) ও ইউসিআরসি-র নেতৃত্বে আন্দোলন

পাঁচের দশকের শুরুতেই কাঁচড়াপাড়া থেকে যাদবপুর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় উদ্বাস্তুরা জবরদখল কলোনি তৈরি করে ফেলেছিলেন। এই জবরদখল কলোনিগুলির প্রতি সরকারের মনোভাব ছিল নেতিবাচক। আবার প্রতিনিয়ত যে বিপুল উদ্বাস্তু জনস্রোত পশ্চিমবঙ্গে

আছড়ে পড়েছিল, তাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই কোথায় দেওয়া যাবে সেই নিয়ে সরকারের কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল না। ঝড়ের সময় বালিতে মুখ গুঁজে থাকার মতো আচরণ করেছিল তৎকালীন রাজ্য সরকার। জবরদখল কলোনিগুলি যখন কলকাতার শহরতলিতে তৈরি হচ্ছিল তখন সরকার সেগুলিকে 'সরকারি ও বেসরকারি জমির অবৈধ দখল' বলে চিহ্নিত করে (unauthorized occupation of govenment and private land)।

সরকার নির্দেশিকা জারি করে যে এই সমস্ত জমিকে ১৫ দিনের মধ্যে ফাঁকা করে দিতে হবে অথবা সরকার জোর করে উদ্বাস্তুদের এই সমস্ত জমি থেকে উঠে যেতে বাধ্য করবে।[১] বলাই বাহুল্য উদ্বাস্তুরা এই ধরনের সরকারি ফতোয়ার তোয়াক্কা করেনি। সরকারি নির্দেশিকাকে বলবৎ করার মতো ক্ষমতাও সরকারের সে সময় ছিল না। ইতিমধ্যেই স্থাপিত ১৪৯টি জবরদখল কলোনির দেড় লক্ষ মানুষকে ভিটেমাটি থেকে উৎখাত করা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয় দেখে সরকার নতুন আইন প্রণয়নের পথ বেছে নেয়।[২]

উদ্বাস্তুদের জবরদখল কলোনির জমি ছেড়ে দেওয়ার জন্য সরকার যে গেজেট নোটিফিকেশন করেছিল তাকে হাতিয়ার করে সক্রিয় হয় জমির মালিকরা। এই সমস্ত জমি ছিল জল, জঙ্গলে পরিপূর্ণ। মনুষ্যবাসের পক্ষে আপাতভাবে অনুপযুক্ত, পরিত্যক্ত এই সমস্ত জমিকেই বাসযোগ্য করে তোলে উদ্যমী বাস্তুহারারা। সেখানে কেবলমাত্র তারা মাথা গোঁজার জন্য কুটির তৈরি করেনি, তার সাথে সাথে স্কুল, সংকীর্তনের জন্য মন্দির, ক্লাব ইত্যাদিও তৈরি করেছিল। অর্থাৎ ছেড়ে আসা পল্লিরই পুনর্নির্মাণ করার চেষ্টা হয় এই সমস্ত জবরদখল কলোনিগুলিতে। কলোনিতে থাকা উদ্বাস্তুদের জমি থেকে উৎখাত করার জন্য জমির মালিকরা পুলিশ এবং ভাড়া করা গুন্ডাদের সাহায্যে বারে বারে আক্রমণ চালাত। কিন্তু বারে বারেই তারা উদ্বাস্তুদের অনমনীয় মনোভাবের কাছে পিছু হটতে বাধ্য হয়।

এমনও ঘটত যে পুলিশ ও গুন্ডাবাহিনী দিনের বেলায় উদ্বাস্তুদের কুটির ধূলিসাৎ করে দেওয়ার পর এক রাতের মধ্যে সেই কুটিরের পুনর্নির্মাণ করে ফেলত উদ্বাস্তুরা। এই ধরনের অসংখ্য ধ্বংস ও পুনর্নির্মাণের সাক্ষী তৎকালীন পশ্চিমবাংলা। দক্ষিণ কলকাতা শহরতলি অঞ্চল যাদবপুরে এই ধরনের আক্রমণ অত্যন্ত তীব্রভাবে সংগঠিত হত। হুগলির মাহেশে পুলিশ ও গুন্ডাবাহিনীর মিলিত আক্রমণ তিন মাসেরও বেশি সময় ধরে চলে। বাস্তুহারাদের ওপর মালিকপক্ষের এহেন আক্রমণের বিরুদ্ধে কোর্টের দ্বারস্থ হয় ইউসিআরসি। কোর্ট রায় দেয় যে যদি কোনো ব্যক্তি কোনো জমিতে টানা তিন মাস বসবাস করে তাহলে তার বিরুদ্ধে কোনোরকম ফৌজদারি মামলা করা যাবে না, যদিও দেওয়ানি মামলা করা যেতে পারে। তিন মাস পর সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনোরকম পুলিশি পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ জারি করে কোর্ট। জবরদখল কলোনির বাসিন্দাদের উপরে যে মারাত্মক হামলা নিয়মিতভাবে সংঘটিত হচ্ছিল গুন্ডাবাহিনী ও পুলিশের পক্ষ থেকে সেক্ষেত্রে খানিকটা স্বস্তির বাতাবরণ তৈরি হয় এবং জবরদখল কলোনির জমির মালিকদের সঙ্গে জবরদখলকারী উদ্বাস্তুদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই রায়ের একটা দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পড়ে।

এমতাবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের সরকার একটি বিল তৈরি করেন যা এভিকশন বিল বা Act XVI of 1951 বলে পরিচিত হয়। এই বিল অনুযায়ী জমির মালিক ৫০ দিনের কোর্ট ফি দিয়ে তার জমি থেকে জবরদখলকারীদের উচ্ছেদের জন্য মামলা করতে পারবেন। কোর্ট নিযুক্ত ইন্সপেক্টররা জবরদখলকারীদের নাম এবং মোট দখলীকৃত জমির পরিমাণ স্থির করবেন। এই বিলের মাধ্যমে যতদিন যাবৎ জমি জবরদখলে ছিল ততদিনের জন্য জমির মালিককে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। সরকার বিধানসভায় এই বিল খুব দ্রুত পাশ করিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলেও এই বিলের একটি কপি ইউসিআরসি নেতৃবৃন্দের হাতে চলে আসে এবং বিলের বিষয়বস্তু নিয়ে তীব্র বিতর্ক ও প্রতিবাদ শুরু হয়।

জবরদখল কলোনি প্রতিষ্ঠা সংবিধানে স্বীকৃত ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে লঙ্ঘন করেছিল এই অছিলায় অসহায় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের বদলে সরকারের কাছে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার রক্ষার বিষয়টি গুরুত্ব পায়। পরে অবশ্য আপাতভাবে সরকার ভারসাম্য রক্ষার জন্য কম দামের জমি এবং বেশি দামের জমির মধ্যে একটা পার্থক্য করে। সরকার আশা করেছিল যে কম দামি জমির মালিকেরা উদ্বাস্তুদের কাছে বিক্রি করে দেবেন। আর বেশি দামের জমি কেনার ক্ষমতা উদ্বাস্তুদের না থাকায় সরকারের আশা ছিল যে উদ্বাস্তুরা সেই জমি ত্যাগ করবেন আইনি জটিলতার ভয়ে। গোটা রাজ্য জুড়ে ব্যাপক প্রতিবাদ হওয়ায় সরকার এই বিলে এমন ব্যবস্থা রাখতে বাধ্য হয় যে জরবদখল কলোনির বাসিন্দাদের বিকল্প পুনর্বাসন না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে তাদের বাসস্থান থেকে উৎখাত করা যাবে না। তবে উদ্বাস্তুরা জবরদখলি জমিকে আইনসম্মত করে নিতে চাইছিলেন এবং তার জন্য তারা যুক্তিসম্মত অর্থ দিতেও রাজি ছিলেন।

ইউসিআরসি নেতৃত্ব বিলের কপি নিয়ে বিভিন্ন কলোনিতে এবং সাংগঠনিক বিভিন্ন সভায় ব্যাপক প্রচার চালায়। কলকাতাতে একের পর এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। গোটা রাজ্যের উদ্বাস্তু জনতা এই বিলের প্রতিবাদে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। ইউসিআরসি-র পক্ষ থেকে রিফিউজি এভিকশন রেজিস্ট্যান্স কমিটি তৈরি করা হয় এবং তারা এই উচ্ছেদ বিলের বিরুদ্ধে বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবাদ বিক্ষোভ সংগঠিত করে জনমত গড়ে তোলে।

বিধানসভার অভ্যন্তরে জ্যোতি বসু-সহ অন্যান্য বামপন্থী বিধায়করা এই এভিকশন বিলের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন। তারা বলেন যে এই বিল অতি দ্রুত পাশ করিয়ে নেওয়ার মূল উদ্দেশ্য বৃহৎ জমির মালিক ও জমির দালালদের স্বার্থ সুরক্ষিত করা কেননা তারা কংগ্রেস পার্টির নির্বাচনী তহবিলে বহু টাকা দিয়েছে এই বিল পাশ করিয়ে নেওয়ার শর্তে। এই বিলের যখন

প্রথম খসড়া তৈরি হয় তখন তাতে রিহ্যাবিলিটেশন বা পুনর্বাসন শব্দটি ছিল না, এভিকশন বা উচ্ছেদ শব্দটি ছিল। বিরোধী পক্ষের চাপে পরবর্তীকালে এই রিহ্যাবিলিটেশন বা পুনর্বাসন শব্দটি যুক্ত হয়। সরকারের যদি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন নিয়ে সদিচ্ছা থাকত তাহলে বিলটির খসড়া প্রস্তুত করার আগেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং উদ্বাস্তুদের সংগঠনগুলির সাথে আলোচনা করেই তারা বিলটি তৈরি করতে পারতেন। কিন্তু সে কাজ তারা করেননি তার কারণ উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন করাটা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না, উদ্বাস্তুদের জবরদখল কলোনি থেকে তাড়িয়ে দেওয়াই তাদের লক্ষ্য ছিল।

১৯৫১ সালের ১৪ এপ্রিল এভিকশন বিল যার পূর্ণাঙ্গ নাম Rehabilitation of Displaced Persons and Eviction of Persons in Unauthorized Occupation of Land Bill, 1951 (Act XVI, 1951) রাজ্য বিধানসভায় পাশ হয়। একজন বর্ষীয়ান সরকারি অফিসারকে Competent Authority বলে ঘোষণা করা হয় যিনি কিনা ভবিষ্যতে জমির মালিকদের কাছ থেকে তাদের বেদখল হয়ে যাওয়া জমি সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ করবেন এবং আইন অনুযায়ী সেই জমি উদ্বাস্তুদের দখলমুক্ত করবার চেষ্টা করবেন। বিধান রায়ের নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার বুঝিয়ে দেয় যে তারা এই বিলকে দ্রুত কার্যকরী করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

নিজেদের রক্ত, ঘাম দিয়ে তৈরি করা কলোনির জমি থেকে উদ্বাস্তুদের উচ্ছেদ করবার এই সরকারি পরিকল্পনা ব্যর্থ করবার জন্য ইউসিআরসি-র নেতৃত্বে বিভিন্ন কলোনিতে তীব্র বিক্ষোভ সংঘটিত হয়। জমির মালিকদের কাছ থেকে অভিযোগ পাওয়ার পর কম্পিটেন্ট অথরিটি হিসেবে যে সরকারি অফিসার নিযুক্ত হন তিনি কলোনির নির্বাচিত কমিটিকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে ব্যক্তিগতভাবে উদ্বাস্তুদের কাছে নোটিস পাঠানো শুরু করেন। এমতাবস্থায় ইউসিআরসি-র পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেওয়া হয়— (১) জবরদখল কলোনিগুলিকে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং কলোনির জমি বিশ্বযুদ্ধের আগেকার দামে দীর্ঘমেয়াদি কিস্তিতে উদ্বাস্তুদের কিনবার সুযোগ দিতে হবে। (২) পতিত এবং অব্যবহৃত কৃষিজমি বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী দামে দীর্ঘমেয়াদি কিস্তিতে বাস্তুহারাদের দিতে হবে। (৩) পরিত্যক্ত মিলিটারি ব্যারাকে এবং ফাঁকা বাড়িতে ন্যায্য ভাড়ার বিনিময়ে উদ্বাস্তুদের থাকতে দিতে হবে। (৪) যে সমস্ত দরিদ্র বাস্তুহারা জমির দাম দিতে পারবেন না তাদেরকে সরকার থেকে ভর্তুকি দিতে হবে এবং অসহায় ও দরিদ্র উদ্বাস্তুদের সরকারি সহায়তায় পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।[৩]

১০ আগস্ট, ১৯৫১ ইউসিআরসি এক্সিকিউটিভ কমিটি প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করে প্রত্যেকটি কলোনিতে এই প্রস্তাবের স্বপক্ষে জনমত সংহত করার আহ্বান জানায়। কেবলমাত্র বাস্তুহারা নয় পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ জনগণের মধ্যেও বাস্তুহারাদের দাবির স্বপক্ষে জনমত গড়ে তোলার জন্য ইউসিআরসি সচেষ্ট হয়। এভিকশন বিলের সংশোধন করার জন্য ইউসিআরসি সরকারের কাছে নিম্নলিখিত দাবি উত্থাপন করে :

১। জবরদখল কলোনির বাসিন্দাদের ন্যায্যমূল্যে কিস্তিতে জমি কেনার অধিকার দিতে হবে।

২। 'বাস্তুহারা'-র সংজ্ঞায় পরিবর্তন আনতে হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের যে সমস্ত মানুষ দেশভাগের আগে পশ্চিমবাংলায় ছিলেন তাদেরকেও এই সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, তার সাথে বাস্তুহারা মুসলিমদেরকেও যুক্ত করতে হবে।

৩। বিকল্প পুনর্বাসন না হওয়া পর্যন্ত কোনো জবরদখল কলোনি, পরিত্যক্ত ব্যারাক বা ফাঁকা বাড়ি থেকে বাস্তুহারদের উৎখাত করা যাবে না।

৪। বাস্তুচ্যুত মুসলমানদের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন ত্রাণ ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫। বৃহৎ জমির মালিক এবং জমির দালালদের জমি সরকারকে অধিগ্রহণ করে বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।[৪]

প্রত্যেকটি কলোনিতে এই সমস্ত দাবির স্বপক্ষে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং পশ্চিমবঙ্গের গরিব মেহনতি মানুষের মধ্যে এই সমস্ত দাবির যথার্থতা নিয়ে প্রচার সংগঠিত করে ইউসিআরসি। ১৯৫১ সালের ২রা ডিসেম্বর, দমদমের নাগেরবাজারে দেশবন্ধু নগরে কনভেনশনের ডাক দেয় ইউসিআরসি। সেখানে বিভিন্ন উদ্বাস্তু কলোনি, ক্যাম্প, ব্যারাক ও বস্তির ১৫০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। এই কনভেনশনে সরকার এবং জনগণের কাছে বাস্তুহারাদের দাবিগুলি উত্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সমস্ত বাস্তুহারাকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এবং পশ্চিমবঙ্গের জনতার সাথে বাস্তুহারাদের ঐক্য গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয় এই কনভেনশনে।

এরই মধ্যে সরকারের পক্ষ থেকে বাস্তুহারাদের উচ্ছেদের নোটিস ধরানো চলতেই থাকে। বাস্তুহারাদের সাথে যাদবপুর, দমদম, সোদপুরের মতো নানা জায়গায় পুলিশ এবং জমিদারদের লেঠেল বাহিনীর সংঘর্ষ হয়। ১৯৫১ সালের ২রা নভেম্বর পোদ্দারনগরে একজন বাস্তুহারা সংঘর্ষে নিহত হন। ওই দিনই ইউসিআরসি এক্সিকিউটিভ কমিটির বৈঠক করে বাস্তুহারাদের ওপর পুলিশি নির্যাতনের নিন্দা করে এবং জমিদার আনন্দীলাল পোদ্দারের লেঠেলবাহিনীর হাতে নিহত বাস্তুহারার মৃত্যুর বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করে।

৭ ডিসেম্বর দমদম নাগেরবাজারের বান্ধবনগরে বাস্তুহারা কলোনির প্রতিনিধিদের কনভেনশন আহূত হয়। এই অঞ্চলে ২০০টি বাস্তুহারা পরিবারকে উচ্ছেদে নোটিশ ধরানো হয়েছিল। বান্ধবনগর কনভেনশন বাস্তুহারা উচ্ছেদের বিরুদ্ধে সরব হয়

এবং সরকারকে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে এই বিষয় নিয়ে সংসদে সরব হন কমিউনিস্ট সদস্যরা। তীব্র বাক-বিতণ্ডার পর সংসদে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে এই দশটি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়ার আগে উচ্ছেদ করা যাবে না। বাস্তুহারাদের উচ্ছেদের বিরুদ্ধে এইভাবে একের পর এক লড়াই আন্দোলন সংগঠিত করে ইউসিআরসি। তীব্র প্রতিরোধের মুখে জবরদখল কলোনির দেড় লক্ষ বাসিন্দার একজনকেও উৎখাত করতে পারেনি তৎকালীন রাজ্য সরকার।

১৯৫৩ সালের ১৫ মার্চ টালিগঞ্জে ইউসিআরসি ২০০টি কলোনির প্রতিনিধিদের নিয়ে কনভেশন আয়োজিত করে। কনভেনশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়।

১। সরকারকে অবিলম্বে সমস্ত বাস্তুহারার পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং তার জন্য তাদের ঋণ দিতে হবে।

২। কোনো কলোনি থেকে একজন উদ্বাস্তুকে উৎখাত করা যাবে না।

৩। বাস্তুহারা কলোনিতে প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলিকে সরকারি সহায়তা দিতে হবে।

৪। টালিগঞ্জ এলাকায় অবস্থিত সমস্ত কলোনিকে টালিগঞ্জ পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৫। ১৯৫১ সালের এভিকশন বিল বাতিল করতে হবে এবং উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য নতুন আইন পাশ করতে হবে।

৬। ২৭ মার্চ কলকাতা ময়দানে কেন্দ্রীয় জনসভা হবে। সেখান থেকে বিধানসভা অভিমুখে মিছিল যাবে।

৭। সরকার আড়াইশোটির মধ্যে ৯৩টি কলোনি নিয়মিতকরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। বাকি কলোনিগুলিকেও নিয়মিতকরণ করতে হবে।[৫]

২৭ মার্চ-এর বদলে ৭ এপ্রিল ময়দানে অনুষ্ঠিত হয় বাস্তুহারাদের কেন্দ্রীয় জনসভা। জনসভা শেষে সত্যপ্রিয় ব্যানার্জি এবং অম্বিকা চক্রবর্তীর নেতৃত্বে বিধানসভার সামনে গিয়ে প্রায় ৮০০০ উদ্বাস্তু নর-নারী হাজির হন। তারা সেখানেই অবস্থান করে বিক্ষোভ দেখানো শুরু করেন। বাস্তুহারাদের এই জমায়েতের সামনে বক্তব্য রাখেন জ্যোতি বসু-সহ অন্যান্য বামপন্থী বিধায়ক। তারা উদ্বাস্তুদের করুণ অবস্থার প্রতি সহমর্মিতা ব্যক্ত করে সরকারের উদাসীনতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। সন্ধ্যা পর্যন্ত অবরুদ্ধ হয়ে থাকে বিধানসভা। এরপর সাতটায় উদ্বাস্তুরা মিছিল করে ময়দানে ফিরে আসেন। সেখানে বাস্তুহারা নেতৃবৃন্দ তাদেরকে পুনরায় এই বিক্ষোভ আন্দোলনের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। বিধানসভায় উদ্বাস্তুদের পক্ষে বাম নেতৃবৃন্দ যে দাবিসনদ পেশ করেছিলেন তাতে গুরুত্বপূর্ণ যে দাবিগুলি ছিল সেগুলি নিম্নরূপ—

১। সরকারের পুনর্বাসন নীতির পুনর্বিন্যাস করতে হবে।

২। সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠন করতে হবে।

৩। ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের মাধ্যমে জমির দাম স্থির করতে হবে।

৪। পরিত্যক্ত ব্যারাক, বস্তি এবং ফাঁকা বাড়িতে যারা আছেন তাদের বিকল্প বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫। বাস্তুহারাদের পাঠানো উচ্ছেদের নোটিস প্রত্যাহার করতে হবে এবং ১৯৫১ সালের এভিকশন আইন বাতিল করতে হবে।

৬। বাস্তুচ্যুত মুসলিমদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং তাদেরকে অন্তর্বর্তীকালীন ত্রাণ দিতে হবে।

৭। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮। সরকারি ক্যাম্পে থাকা উদ্বাস্তুদের দ্রুত পুনর্বাসন করতে হবে এবং সরকারি ক্যাম্পের প্রশাসনের আমূল পরিবর্তন ঘটাতে হবে।

৯। ওয়ার্ক সাইট ক্যাম্পের উদ্বাস্তুদের জন্য যথাযথ কাজ এবং যথাযথ মজুরির ব্যবস্থা করতে হবে।

১০। কর্মহীন উদ্বাস্তুদের জন্য ত্রাণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১১। যথাযথ পুনর্বাসন হওয়ার পরেই কেবলমাত্র উদ্বাস্তুদের দেওয়া ঋণের কিস্তি পরিশোধের ব্যবস্থা করতে হবে।[৬]

১৯৫৪ সালের ১৭ জুলাই, ইউসিআরসি নেতৃবৃন্দ তৎকালীন কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী এ পি জৈনের সাথে দেখা করেন, যিনি এই জবরদখল কলোনিগুলো আইনসম্মত করার ব্যাপারে সহমত প্রকাশ করেন।

১৯৫৭ সালে পূনরায় রাজ্য সরকার জবরদখল কলোনি উচ্ছেদের চেষ্টা চালায়। বিধানসভায় এই উদ্দেশ্যে বিল উত্থাপিত হলে ঐ বছর ১০ জুলাই উদ্বাস্ত পুনর্বাসন ও অননুমোদিত দখলকারী উচ্ছেদ (সংশোধনী) বিল প্রত্যাহারের দাবিতে বিধানসভা অভিমুখে দশ হাজার উদ্বাস্তদের অভিযান হয়। ১৭ জুলাই বিরোধী দলনেতা জ্যোতি বসু ইউসিআরসি, সারা বাংলা বাস্তহারা সম্মেলন, ইস্ট বেঙ্গল রিলিফ কমিটি এই তিনটি বাস্তহারা সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের সাথে বৈঠক করেন। বাস্তহারা সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে দাবি উত্থাপন করা হয়–

১। জবরদখল কলোনি থেকে যেন কোনো উদ্বাস্ত প্লট হোল্ডারকে উচ্ছেদ না করা হয়,

২। উদ্বাস্তুদের কর্মসংস্থানের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠা করা হয় (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে সরকার এক্ষেত্রে অর্থাভাবের অজুহাত দেখায়),

৩। বাস্তুচ্যুত মুসলমানদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা,

৪। বিনিময়কৃত সম্পত্তি বৈধ করা।[৭]

ইউসিআরসি-র নেতৃত্বে ব্যাপক আন্দোলন এবং বিধানসভার ভেতরে ও বাইরে বামপন্থীদের সক্রিয় সমর্থনের ফলে সরকার জবরদখল উচ্ছেদের ধারাটি উঠিয়ে নিতে বাধ্য হয়। উদ্বাস্তু আন্দোলন এক গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করে।

পঞ্চাশের দশকের শুরু থেকেই রাজ্য সরকারের উদাসীনতার জন্য ক্রমাগত রাজ্যজুড়ে ক্ষুধার প্রকোপ বাড়তে থাকে। অপুষ্টিতে আক্রান্ত হয়ে নানারকম অসুখে ভুগে মারা যেতে থাকেন রাজ্যের মানুষ। বাম দলগুলো এই দুর্বিষহ পরিস্থিতিতে খাদ্যের দাবিতে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তোলে। পশ্চিমবাংলার দারিদ্র্যক্লিষ্ট উদ্বাস্তু জনতা রাজ্যের খাদ্য সংকটের অন্যতম শিকার ছিল। স্বভাবতই বামপন্থীদের ডাকা গণআন্দোলনে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগদান করে। ১৯৫১ সালে উত্তরবঙ্গের কুচবিহার জেলায় প্রথম উদ্বাস্তু জনতা খাদ্যের দাবিতে সংগ্রাম করে শহীদের মৃত্যু বরণ করে। কুচবিহার শহরে সাগরদিঘির পাড়ে উদ্বাস্তু জনগণ খাদ্যের দাবিতে সরব হলে পুলিশ গুলি চালিয়ে পাঁচজনকে হত্যা করে। কুচবিহারের শহীদবাগে পঞ্চ শহীদের স্মারকস্তম্ভ রয়েছে।

ছয় ও সাতের দশকে উদ্বাস্তু আন্দোলন

ষাটের দশকের শুরু থেকেই উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য লড়াই তীব্রতর হয়ে ওঠে। উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন নিয়ে তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের সমালোচনা করে জ্যোতি বসুর বক্তব্য ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি বলেন, "বঙ্গ বিভাগে রাজি হয়ে কংগ্রেসি নেতারা তো তড়িঘড়ি ক্ষমতায় বসলেন। তখন তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুরা যদি এদেশে চলে আসতে বাধ্য হন তাহলে তাদের দায়িত্ব এদেশের সরকার গ্রহণ করবে। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি পালনে কোনো সুষ্ঠু উদ্যোগ দেখা গেল না। ত্রিশ-চল্লিশ লক্ষ উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের সমস্যা সমাধান করাটা যে যথেষ্টই কঠিন কাজ তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আজন্মের ভিটা-মাটি, জীবিকা, সহায়-সম্বল ত্যাগ করে যারা শুধুমাত্র সরকারের আশ্বাসের উপর ভরসা করে চলে এল তারা যে নিতান্ত বাধ্য না হলে, নিতান্ত নিরুপায় না হলে আসতেন না তা কংগ্রেসি নেতাদের বিবেচনার বাইরে রয়ে গেল।

যদি পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র অর্থনীতির সাথে এদেরকে মিলিয়ে দেওয়া যেত যদি শিল্প ও কৃষি সামগ্রিক সুষম বিকাশের পরিকল্পনা নেওয়া হত তাহলে এই উদ্বাস্তুরাই তাদের পরিশ্রম শক্তি ও বুদ্ধির ব্যবহারে এ রাজ্যের তথা দেশের পক্ষে এক উল্লেখযোগ্য মানবিক সম্পদ হতে পারত এবং পশ্চিমবঙ্গ তথা দেশের উন্নয়নে বা পুনরুজ্জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারত। কিন্তু তা তো হবার নয়– কেননা কংগ্রেস সরকার নিজস্ব চরিত্র অনুযায়ী জমিদার-পুঁজিপতিদের তোষণকারী এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থবিরোধী। তাই কংগ্রেস সরকার কখনোই উদ্বাস্তুদের সম্পদ হিসেবে গ্রহণ করেনি, তাঁদেরকে শুধু নাছোড়বান্দা ভিখারিরূপেই দেখেছে। তাঁদের উদ্বাস্তু নীতির দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যেন এইরকম– যাকে নেহাত এড়াবার উপায় নেই তাকে কিছু ভিক্ষা দেওয়া যাক।"[১]

ইংরেজিতে একটি কথা আছে, beggars cannot be choosers, তাই যাদেরকে ভিখারি ভেবেছিল তৎকালীন সরকার সেই বাস্তুহারাদের যে কোনো মতামত থাকতে পারে এবং সেই মতামতকে মূল্য দেওয়া দরকার এই বোধটাই রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের ছিল না।

১৯৬০ সালে বেলঘরিয়াতে ইউসিআরসি-র যে বিশেষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তার উদ্বোধন করতে গিয়ে জ্যোতি বসু সরকারের পুনর্বাসন নীতির পাহাড়প্রমাণ ব্যর্থতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন যে এই ব্যর্থতার মুখে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তর তুলে দিয়ে তৃতীয় পরিকল্পনায় নাম মাত্র কয়েক কোটি টাকা বরাদ্দ করার কথা চিন্তা করছে সরকার। এইভাবে উদ্বাস্তু সমস্যাকে জনগণের মন থেকে মুছে ফেলার যে নীতি সরকার গ্রহণ করছে তাকে ব্যর্থ করে সুষ্ঠু পুনর্বাসনের দাবিতে ব্যাপক ও তীব্র সংগ্রামের কর্মসূচি সম্মেলন থেকে গ্রহণ করবার জন্য তিনি আহ্বান জানান।[২]

বেলঘরিয়ায় অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদের সারা ভারত সম্মেলনে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক যে সেখানে বিভিন্ন রাজ্য থেকে যে উদ্বাস্তু প্রতিনিধিরা আসেন তারা একথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন যে পুনর্বাসন স্থল ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসা তাদের উদ্দেশ্য নয়। উদ্বাস্তুতে পরিণত হবার মর্মজ্বালা পূর্ববঙ্গ থেকে আসা ছিন্নমূল উদ্বাস্তুরা জানেন, অন্য রাজ্য থেকে আর একবার উদ্বাস্তু হয়ে তারা নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে যেতে চান না তাই তারা পশ্চিমবঙ্গে আসতে উৎসুক নন বরং তারা সেই রাজ্যে বসবাস করতে চান কিন্তু সেখানকার রাজ্য সরকার চক্রান্ত, বলপ্রয়োগ, সশস্ত্র পুলিশ নিয়োগ প্রভৃতি দ্বারা তাদের আবার উদ্বাস্তুতে পরিণত করতে চায়। এর বিরুদ্ধে সারা ভারত সম্মেলন ঘোষণা করছে বিচ্ছিন্ন সংগ্রাম নয়, এবার একতাবদ্ধ সংগ্রামই একমাত্র পথ।

সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে বিশেষ গুরুত্বের সাথে বলা হয় যে পুনর্বাসন দপ্তর তুলে দেবার সরকারি সিদ্ধান্ত এবং কোনো কোনো স্থানে পুনর্বাসন দপ্তর ইতিমধ্যে তুলে দেওয়ায় উদ্বাস্তু সমস্যা আরও তীব্র হয়েছে। তাই এই সম্মেলন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে কেন্দ্রীয় সরকারের পুনর্বাসন মন্ত্রক তুলে দেবার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সারা ভারত ব্যাপী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

এছাড়া উদ্বাস্তুদের চরম আর্থিক দুর্দশার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার প্রদত্ত ঋণ আদায় স্থগিত রাখার প্রস্তাব সম্মেলনে গৃহীত হয়। অপর একটি প্রস্তাবে ভারত সরকারের বিপজ্জনক পুনর্বাসন নীতির বিরুদ্ধে সারা ভারত প্রতিবাদ দিবস পালন করবার আহ্বান জানানো হয় এবং পুনর্বাসন সম্পর্কে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করার দাবি উত্থাপন করা হয়।[৩]

১৯৬১ সালের মার্চ মাসের মধ্যে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দপ্তর তুলে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে দায়িত্বজ্ঞানহীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তার বিরুদ্ধে ইউসিআরসি-র ষষ্ঠ সম্মেলন গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং পুনর্বাসনের দায়িত্ব অস্বীকার করবার সরকারি নীতি পরিবর্তনের জন্য "ব্যাপক, ঐক্যবদ্ধ, দীর্ঘস্থায়ী, শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম" গড়ে তুলবার জন্যে উদ্বাস্তু জনসমাজের কাছে আহ্বান জানায়। সরকার যদিও মুখে বলছিল যে তারা ক্যাম্পগুলির দ্রুত বিলুপ্তি চান অথচ তাদের কার্যকলাপের ফলেই ক্যাম্প উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন অহেতুক বিলম্বিত হচ্ছিল। কিন্তু সরকার নিজের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য সুকৌশলে উদ্বাস্তুদের ঘাড়েই এই ব্যর্থতার দায় চাপিয়ে যাচ্ছিল এবং উদ্বাস্তুদের উপর দমনপীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের অজুহাত হিসেবে একে ব্যবহার করছিল। ক্যাম্প উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সম্পর্কে রাজ্য সরকারের কাছে যেন একটিই মাত্র সমাধান ছিল। তা হল দণ্ডকারণ্যে পাঠিয়ে দেওয়া। অথচ পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে তখনও পুনর্বাসনে সুযোগের সদ্ব্যবহার করা যেত। এদিকে দণ্ডকারণ্য প্রকল্পেরও অবস্থা তখন এতটাই অগোছালো ছিল যে ১৯৫৮ সালে যেখানে ৩৫ হাজার পরিবারকে দণ্ডকে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছিল সেখানে ১৯৬১ সালে মাত্র ৬/৭ হাজার পরিবারকে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়। অর্থাৎ পুরো পুনর্বাসনের প্রক্রিয়াটাকেই কার্যত ছেলেখেলায় পরিণত করে তৎকালীন সরকার। এর বিরুদ্ধে বাস্তুহারারা বিক্ষোভ আন্দোলনে শামিল হন। দণ্ডকারণ্যের দোহাই দিয়ে পশ্চিমবাংলার পুনর্বাসন ব্যবস্থাগুলি স্থগিত রাখা বা শ্লথ গতিতে কার্যকর করার বিরুদ্ধে ইউসিআরসি উদ্বাস্তুদের সমবেত করে।[৪] বিভিন্ন PL ক্যাম্প থেকে এই সময় বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা উদ্বাস্তু মহিলাদের বেনারস, কাশীর মতো তীর্থক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই অসহায় মহিলাদের জীবন ছিল অত্যন্ত কষ্ট ও অপমানে ভরা। স্থানীয় প্রশাসনও ছিল এদের প্রতি উদাসীন।

পাঁচের দশকের শেষ দিকে খাদ্য সংকট তীব্রতর হলে ইউসিআরসি-র সম্মেলনগুলিতে খাদ্য আন্দোলনে উদ্বাস্তুদের অংশগ্রহণের স্বপক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হয়। সংবাদপত্র মারফত জানা যাচ্ছে যে ১৯৫৯ সালের ৩১ আগস্ট, কলকাতায় খাদ্যের দাবিতে যে বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় সেখানে যাতে ক্যাম্পবাসী বাস্তুহারা জনগণ অংশগ্রহণ না করতে পারে সেই জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ক্যাম্পবাসী উদ্বাস্তুদের উপরে হুকুমনামা জারি করে এবং সরকার বিরোধী শোভাযাত্রায় তাদের অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করে। সরকারি হুকুমনামায় বলা হয় যে সরকার বিরোধী শোভাযাত্রায় যদি কোনো ক্যাম্পের উদ্বাস্তু অংশগ্রহণ করে তবে তার সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা কেড়ে নেওয়া হবে। ওইদিন বিভিন্ন রিফিউজি ক্যাম্পে বেলা তিনটার সময় ক্যাম্প অফিসে হাজিরা দেওয়ার জন্য প্রত্যেককে নির্দেশ দেওয়া হয় এবং কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে ক্যাম্পের বাইরে যাওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।[৫]

এই সমস্ত নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও খাদ্যের দাবিতে সংগঠিত গণ-আন্দোলনে উদ্বাস্তুদের অংশগ্রহণ বন্ধ করা যায়নি। বরং আইন অমান্য করে উদ্বাস্তুরা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় গ্রেপ্তার হন। খাদ্যের দাবিতে লড়াই আসলে ছিল বাঁচা-মরার সংগ্রাম। ফলে সেখানে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ফতোয়া মানতে কোনো মতেই রাজি ছিল না বাংলার ক্ষুধার্ত এবং বঞ্চিত উদ্বাস্তু জনতা। অন্য দিকে সরকার তীব্র দমনপীড়নের পথ বেছে নেয়।

১৯৬৬ সালে পুনরায় খাদ্য আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। গোটা রাজ্যে সে সময় চাল এবং কেরোসিনের প্রচণ্ড আকাল। কংগ্রেস সরকারের দুর্ভিক্ষ সৃষ্টিকারী খাদ্য নীতি-সহ সমস্ত জনবিরোধী পদক্ষেপ ও দুর্নীতির প্রতিবাদে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র ডাকে ১৯৬৬ সালের ৩০ জানুয়ারি মনুমেন্টের পাদদেশে বিশাল জনসভা আহ্বান করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় গণবিক্ষোভ তীব্রতর হয়ে ওঠে। চাল ও কেরোসিনের দাবিতে সংঘটিত উত্তাল গণআন্দোলনে এবারেও দরিদ্র উদ্বাস্তু জনগণ ব্যাপক সংখ্যায় অংশগ্রহণ করে। অর্থনৈতিক সংকট ও অনিশ্চয়তার সাথে সাথে সরকারের দমনপীড়ন উদ্বাস্তুদের এই রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। স্বাভাবিকভাবেই খাদ্য আন্দোলনে তারা ব্যাপক সংখ্যায় শামিল হয়। সরকারও প্রত্যাঘাত করে কঠোর দমনপীড়নের মাধ্যমে। উদ্বাস্তু কলোনিগুলিতে ব্যাপক ধরপাকড় চলে। এই সময় কলোনিগুলোতে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে উদ্বাস্তু নারীদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং অত্যাচারিত পরিবারগুলির পাশে দাঁড়াবার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়।

উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের দায় অস্বীকার করবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ষাটের দশকের শুরুতেই তৎকালীন রাজ্য সরকারের সক্রিয় সহযোগিতায় ঘোষণা করে যে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কাজ শেষ হয়ে গেছে। যা বাকি আছে তা এখন 'অবশিষ্ট সমস্যা' (Residual problem)। পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু সমস্যার পরিধি ও গভীরতাকে খাটো করে দেখানোর জন্য তৎকালীন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার কাল্পনিক ও ভুল তথ্য পরিবেশন করে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছিল। সরকারের ভ্রান্ত তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় যে সর্বসাকুল্যে পশ্চিমবঙ্গে ৮ লক্ষ ৯ হাজার উদ্বাস্তু পরিবার এসেছে। যার মধ্যে এক লক্ষ চুয়াত্তর হাজার পরিবারকে বিভিন্নভাবে বাংলার মধ্যে এবং ৫৫ হাজার পরিবারকে দণ্ডকারণ্য-সহ বাংলার বাইরে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে বলে সরকারের কাল্পনিক তথ্য দাবি করে। এই দাবিকে খণ্ডন করে ইউসিআরসি-র পক্ষ থেকে বলা হয় যে এই কাল্পনিক তথ্য হতেও দেখা যাচ্ছে যে লক্ষ লক্ষ পরিবার পুনর্বাসনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তাহলে এই পুনর্বাসনের কাজ যা কিনা অসমাপ্ত তাকে প্রায় একই স্থানে ফেলে রেখে পুনর্বাসনের কাজ শেষ হয়ে গেছে বলে ঘোষণা করা জনগণকে প্রতারণা করা এবং জনমতকে বিভ্রান্ত করার ষড়যন্ত্র। উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের সমস্যাকে 'অবশিষ্ট সমস্যা' বলে গণ্য করবার যে তত্ত্ব তার ভিত্তিতেই কেন্দ্রীয় সরকারের পুনর্বাসন

দপ্তর গুটিয়ে আনা হয় এবং সমগ্র সমস্যাটি মেটানোর জন্য মাত্র ২১ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়।

ষাটের দশকের শুরু থেকেই তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে গণ-অসন্তোষ এক তীব্র আকার ধারণ করতে থাকে এবং পুনর্বাসনের সমস্যাও ক্রমশ সংকটপূর্ণ রূপ ধারণ করে। ইউসিআরসি-র ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম সম্মেলনে উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য কেন্দ্র ও রাজ্যের কংগ্রেস সরকারের দায়িত্বজ্ঞানহীন মনোভাবকেই দায়ী করা হয়। এই সময় উদ্বাস্তু আন্দোলনকে দমন করার জন্য কংগ্রেস সরকার মরিয়া হয়ে উঠেছিল। ইউসিআরসি-র ষষ্ঠ সম্মেলন যা কিনা হওয়ার কথা ছিল রানাঘাটের রূপশ্রী পল্লীতে তাকে বানচাল করার জন্য একমাস রানাঘাটে উদ্বাস্তু আন্দোলনের নেতাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে তৎকালীন রাজ্য সরকার। তা সত্ত্বেও লড়াই-আন্দোলন থেমে থাকেনি। ইউসিআরসি-র পক্ষ থেকে জীবন জীবিকার সংকট মোকাবিলা করার জন্য আরো তীব্র গণআন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়। এই পরিস্থিতিতে বাস্তুহারা জনতা ক্রমশ একথা উপলব্ধি করতে পারে যে সরকারের নীতির জন্যই সর্বত্রই সংকট সৃষ্টি হচ্ছে। এই সরকার অর্থনৈতিক সংকটের সমাধান করতে পারছে না এবং রাজনৈতিক সংকটের আবর্তে পড়ছে। জনগণের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে যখন কংগ্রেস দল পরাস্ত হয় এবং যুক্তফ্রন্ট সরকার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। যুক্তফ্রন্ট সরকারের ১৮ দফা কর্মসূচির মধ্যে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের দাবি গ্রহণ ও সমস্যার কথাও অন্তর্ভুক্ত হয় কিন্তু কেন্দ্রের বরাদ্দ অর্থে পরিচালিত রাজ্য পুনর্গঠন মন্ত্রণালয়কে যে কঠোর বাধানিষেধের মধ্যে কাজ করতে হয় তার ইউসিআরসি উপলব্ধি করে। অথচ সীমাবদ্ধতার মধ্যেও যুক্তফ্রন্ট সরকার যে কাজ করেছিল তার মধ্যে যে রাজনৈতিক সদিচ্ছার কোনো অভাব ছিল না ইউসিআরসি-র নবম ও দশম সম্মেলনে সে কথা গুরুত্বের সাথে উল্লেখিত হয়।

ইউসিআরসি সহ-সভাপতি নিরঞ্জন সেনগুপ্ত যুক্তফ্রন্ট সরকারের পুনর্বাসন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হওয়ায় “উদ্বাস্তুদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে” বলে আশা প্রকাশ করে ইউসিআরসি-র নবম সম্মেলন। ১৭ থেকে ১৯ নভেম্বর, ১৯৬৭ অশোকনগরে অনুষ্ঠিত হয় এই সম্মেলন। সম্মেলন দাবি করে যে কেন্দ্রীয় সরকারকে পুনর্বসতির জন্য যাবতীয় অর্থ বরাদ্দ করতে হবে এবং নিঃশর্তে এই অর্থ ব্যয়ের সুযোগ যুক্তফ্রন্ট সরকারকে দিতে হবে। সম্মেলনে এই কথা দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত হয় যে উদ্বাস্তুদের কর্মশক্তিকে পুনর্বাসনের মাধ্যমে কাজে লাগানোর দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের এবং পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের ব্যর্থতার জন্য দায়ী রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব এবং পরিকল্পনা সংক্রান্ত ত্রুটি। নবম সম্মেলন পুনরায় এই কথা জোরের সঙ্গে ব্যক্ত করে যে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সমস্যার সমাধান করতে হলে জীবিকার প্রশ্নকে পুনর্বাসনের প্রধান প্রশ্ন হিসেবে গণ্য করতে হবে।[৬]

ইউসিআরসি-র দশম সম্মেলনে বলা হয় যে চার লক্ষাধিক উদ্বাস্তু পরিবার সরকারি ও বেসরকারি কলোনিতে জীবন-জীবিকা, গৃহ সমস্যা ও কলোনির উন্নয়নের সমস্যায় জর্জরিত হয়ে আছে। এই সময়ে পিএল ক্যাম্প, হোম, ইনফার্মারিতে ১০ হাজার পরিবার পুনর্বাসনের প্রাপ্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে এক নরক যন্ত্রণার মধ্যে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছিল। এই সময় পরিত্যক্ত ক্যাম্পে বসবাসকারী উদ্বাস্তু পরিবারের সংখ্যা ছিল ১০০০০। সেই পরিবারগুলির পুনর্বাসন পরিকল্পনা অত্যন্ত ধীরগতিতে অগ্রসর হচ্ছিল। জবরদখল কলোনিগুলোতে নানারকমের সমস্যা তখনও রয়ে গিয়েছিল। জমির মালিকানা স্বত্বের দলিল, কলোনি উন্নয়ন, পৌর-পঞ্চায়েতের সুযোগ প্রবর্তন করার দাবি ইত্যাদির প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেনি পূর্বতন কংগ্রেস সরকার। এই সমস্ত কলোনির বাসিন্দাদের গৃহ পুনর্গঠনের জন্য ঋণ, জীবিকার ক্ষেত্রে সাহায্য দেওয়া হচ্ছিল না। ফলে জবরদখল কলোনির বাসিন্দাদের জীবন সরকারের উদাসীনতার জন্য দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। ইউসিআরসি-র মূল বক্তব্য ছিল এই যে সমস্যা যখন এতটাই ব্যাপক এবং জটিল তখন তাকে রেসিডুয়ারি বা অবশিষ্ট সমস্যা বলে গণ্য করাটা সরকারি প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়।[৭]

যুক্তফ্রন্ট সরকার ও উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের উদ্যোগ

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সম্পর্কিত নীতির ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। পূর্বতন কংগ্রেস সরকারের পতনের পর গঠিত এই সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল মানবিক ও গঠনমূলক। বামপন্থী দলগুলো ছিল এই সরকারের চালিকাশক্তি এবং স্বাধীনতার পর তারাই ছিল উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের আন্দোলনের সামনের সারিতে। কেন্দ্রীয় সরকারের তৎকালীন উদ্বাস্তু নীতি ছিল, যে সমস্ত নতুন উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে বসবাসের পক্ষপাতী অথবা ক্যাম্পে বসবাসকারী যেসব উদ্বাস্তু দণ্ডকারণ্যে বা রাজ্যের বাইরে অন্যত্র পুনর্বাসনের সুযোগ গ্রহণের অনিচ্ছুক তাদের পুনর্বাসনের আর কোনো সুযোগ-সুবিধা দেওয়া যাবে না। কিন্তু তৎকালীন যুক্তফ্রন্ট সরকারের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন মন্ত্রী নিরঞ্জন সেনগুপ্ত এই দুই শ্রেণির উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের দাবি জানান।

তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সমস্ত বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন এবং বলেন যে এই দুই শ্রেণির উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির স্বার্থেই প্রয়োজন এবং তিনি প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার জন্য অনুরোধ করেন। শ্রী সেন এই প্রসঙ্গে ক্যাম্পে যেসব উদ্বাস্তু বাস করছেন তাদের চরম দুর্দশার কথা জানান। এদের সমস্ত সুযোগ সুবিধা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু রাজ্য পুনর্গঠন উপদেষ্টা কমিটি এদের পুনর্বাসনের একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে যা রূপায়ণে ৬ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা দরকার ছিল। এই অর্থের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ জানান রাজ্যের পুনর্বাসন মন্ত্রী। তিনি উদ্বাস্তুদের শিক্ষা ও চিকিৎসার সাহায্য পুনঃপ্রবর্তনের দাবিও জানান।[৮]

প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার উদ্বাস্তু পুনর্বাসন এবং উদ্বাস্তু জীবনের উন্নতি সাধনের জন্য বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল যা কিনা ইউসিআরসি সম্মেলনে গুরুত্বের সাথে উল্লেখিত হয়। কোনো সন্দেহ নেই যে উদ্বাস্তু আন্দোলনের প্রতি

তৎকালীন যুক্তফ্রন্ট সরকারের সহানুভূতি এবং সহমর্মিতা থাকার জন্যই এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্বাস্তু বিরোধী মনোভাব থাকার দরুন অত্যন্ত কঠোর বিধিনিষেধের মধ্যে দিয়ে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়কে রাজ্যে কাজ করতে হত। তা সত্ত্বেও তারা ভবঘুরে, পরিত্যক্ত ক্যাম্প উদ্বাস্তু, জবরদখল কলোনি এবং পরিত্যক্ত গৃহের বাসিন্দাদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা চালু করে। এই সময় জবরদখল কলোনি, ক্যাম্প প্রভৃতি স্থানে কেন্দ্রীয় সরকারের বাধানিষেধের বেড়া জাল ভেদ করে নলকূপ স্থাপন করা হয়। দলমত নির্বিশেষে দুস্থ উদ্বাস্তুদের সাময়িক অর্থ সাহায্য করা হয়। দুরারোগ্য ব্যাধি ও টিবি রোগীদের চিকিৎসার যে সুযোগ-সুবিধা বন্ধ ছিল তা কিছুটা চালু করা হয়, ক্যাম্প উদ্বাস্তুদের ক্যাশ ডোলের পরিমাণ কিছুটা বাড়ানো হয়। পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের অবস্থা কী, উদ্বাস্তু সংখ্যা কত প্রভৃতি সম্পর্কে বাস্তব পরিস্থিতি জানবার জন্য এবং সুষ্ঠু পুনর্বাসনের পরিকল্পনার ব্যাপারে পরামর্শ দানের জন্য স্টেট রিহ্যাবিলিটেশন কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সম্পর্কিত খুব গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনার সুপারিশ করে এবং তার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্বাসন কেন্দ্র সরকারের নিকট ২৫০ কোটি টাকা মঞ্জুরির দাবি করে। দুর্ভাগ্যের বিষয় প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ভেঙে দেওয়া হলে এই কমিটির অস্তিত্ব খারিজ হয়ে যায়। প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার সর্বস্তরে উদ্বাস্তুদের নির্বাচিত কমিটিকে স্বীকৃতি দেওয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কেন্দ্রের অর্থে পরিচালিত অস্থায়ী পুনর্বাসন দপ্তরে ৫ বছরের ওপর যারা চাকরি করছেন তাদের স্থায়ী করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উৎপাদন কেন্দ্রে ও হোমের কর্মচারীদের পারিবারিক ভাতা বাড়ানো হয়। সীমাবদ্ধতার মধ্যেও রাজ্য পুনর্বাসন মন্ত্রক তথা যুক্তফ্রন্ট সরকারের এই সমস্ত কার্যাবলি উদ্বাস্তু জনসাধারণের মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার করে।[৯]

প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থাকার জন্য পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মধ্যবর্তী নির্বাচন যখন অনুষ্ঠিত হয় তখন জনজাগরণের গতি ও প্রবাহের দিকে লক্ষ্য রেখে ইউসিআরসি সংগঠনগতভাবে নির্বাচনী সংগ্রামে যুক্তফ্রন্টের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে। কেননা এই সংগঠন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে পশ্চিমবঙ্গে যে কায়েমি স্বার্থ উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কাজকে উপেক্ষিত রেখেছিল এতকাল তাদের বিরুদ্ধে বিকল্প সরকার প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। আর সেই জন্যই যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইউসিআরসি সংগঠনগতভাবে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইউসিআরসি-র দশম সম্মেলনে লেখা হয়, "উদ্বাস্তু জনসাধারণকেও আজ পশ্চিমবাংলার যুক্তফ্রন্ট সরকারকে সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করিয়া পশ্চিমবাংলার সংগ্রামরত অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তি তথা শ্রমিক-কৃষক মধ্যবিত্ত ছাত্র-যুবকের সংগ্রামের পাশে দাঁড়াইয়া নিজেদের পুনর্বাসনের সংগ্রামকে তীব্রতর করিতে হইবে এবং দেশের সামগ্রিক গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সচেতন ও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে।"[১০]

১৯৬৯ সালে দমদমে ইউসিআরসি-র যে দশম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সেখানে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের জন্য তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে সমস্যা সমাধানে বাধ্য করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু সম্মেলন সমাপ্তির কিছুদিনের মধ্যেই যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটে। পশ্চিমবঙ্গে চালু হয় রাষ্ট্রপতি শাসন।

সত্তরের দশকের আধা-ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাস ও উদ্বাস্তু আন্দোলন

যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পর কংগ্রেসের গুন্ডাবাহিনী, মিলিটারি, সিআরপি, পুলিশ ও প্রশাসন যন্ত্রের একাংশের সহযোগিতায় আধা ফ্যাসিস্ট কায়দায় শ্রমিক-কৃষক ছাত্র-যুব শিক্ষক মহিলা-সহ সকল গণতান্ত্রিক মানুষের উপর এক সর্বগ্রাসী আক্রমণ সংঘটিত হয়। পশ্চিমবাংলার গণতান্ত্রিক মানুষের অংশ হিসেবে উদ্বাস্তুদের এই ঘৃণ্য আক্রমণের মোকাবিলা করতে হয়েছে। ১৯৭১ সালের ১০-১২ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত ইউসিআরসি-র একাদশ সম্মেলনে উল্লেখিত হয় যে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের নামে সরকারি হিসেব অনুযায়ী ১৯৭০ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ২৬০.৩৪ কোটি টাকা খরচ করার কথা বলা হলেও বাস্তবে তার অধিকাংশই প্রকৃতপক্ষে অপব্যয় করা হয়েছে। এই টাকার অতি নগণ্য অংশই উদ্বাস্তুরা পেয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে উদ্বাস্তু সমস্যাকে অবশিষ্ট সমস্যা হিসেবে কংগ্রেস সরকার আখ্যা দেওয়ার পরে উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে তাদের কোনোরকম গরজ আর লক্ষ করা যায়নি। কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দপ্তরকে গুটিয়ে তাকে শ্রমদপ্তর এর একটি অংশে পরিণত করা হয় এবং তথাকথিত অবশিষ্ট সমস্যা মেটানোর জন্য মাত্র ২১.৮৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। এই যৎসামান্য টাকায় উদ্বাস্তু পুনর্বাসন এর কাজ যে হয়নি তা বলাই বাহুল্য। ফলে আগেই উল্লেখ হয়েছে করা হয়েছে যে যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে আড়াইশো কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে চাওয়া হয়। অবশ্য সেই দাবি পূরণ করেনি কেন্দ্রীয় সরকার।[১১]

যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পর নতুন যে চ্যালেঞ্জের সামনে পশ্চিমবঙ্গ উপস্থিত হয় তা হচ্ছে বাংলাদেশের নবাগত উদ্বাস্তু। বর্বর ইয়াহিয়া শাহির আক্রমণে পূর্ব বাংলার হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে প্রায় এক কোটি মানুষ দেশত্যাগ করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হন। ইউসিআরসি বাংলাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রাম জয়যুক্ত হওয়া পর্যন্ত এই মানুষদের আশ্রয় ও রিলিফ দেওয়ার ব্যাপারে সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণে ও বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য ভারত সরকারের কাছে আহ্বান জানায়।

একাদশ সম্মেলনে এই কথা জোরের সঙ্গে উত্থাপিত হয় যে আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য অতীতের ধারা বজায় রেখে গণতান্ত্রিক ও শ্রেণিগত আন্দোলনে উদ্বাস্তুদের ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে। সমাজের অপরাপর অংশের গণসংগ্রামগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে ঐক্যবদ্ধভাবে উদ্বাস্তুদের সমস্যা সমাধানের লড়াইয়ে পুনরায় অংশগ্রহণ করবার জন্য

আহ্বান জানায় সংগঠনের একাদশ সম্মেলন।

১৯৭২ সালে পশ্চিমবঙ্গে আবার কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর উদ্বাস্তু পুনর্বাসন এর জন্য যে মাস্টার প্ল্যান পাঠানো হয় কেন্দ্রের কাছে তার রূপায়ণ নিয়ে ইউসিআরসি সংগতভাবেই সন্দেহ প্রকাশ করে। ১৯৭৩ সালের ৮ই জুলাই ইউসিআরসি-র বিশেষ সম্মেলনে এবং ১৯৭৪ সালে বারাসাতে অনুষ্ঠিত বিশেষ সম্মেলনের প্রস্তাবে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা আছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয় প্রথমত, এটি একটি সুপারিশ মাত্র। অতীতে বার বার দেখা গিয়েছে যে সরকারের প্রচার আর কাজের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য থেকে যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, চলমান পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম বছরে এই মাস্টার প্ল্যানের জন্য কোনো বরাদ্দ তো হয়ইনি বরং পরিকল্পনা ছাঁটাই করতে বলা হয়েছে। উদ্বাস্তু জনগণকে আর বিশেষভাবে দেখা হবে না অন্যান্য দরিদ্র ও দুর্বল অংশের মানুষের মতোই তাদের সমস্যাকে দেখা হবে একথা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এর ফলে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কাজ যে ব্যাহত হবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। চতুর্থত, ৩১ মার্চ, ১৯৭৪-এর মধ্যে পুনর্বাসন দপ্তর বন্ধ করে দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তা অযৌক্তিক এবং অন্যায্য। পঞ্চমত, ১৫০ কোটি টাকার মূল দাবিকে কমিয়ে এনে করা হয়েছে ৮২ কোটি ৬১ লাখ টাকা অর্থাৎ সরকার যে আর্থিক দায়ভার বহন করতে চাইছে না তা এই কাজের মাধ্যমেই পরিষ্কার।

মাস্টার প্ল্যানে আগে বলা হয়েছিল যে জমির মালিকানা স্বত্ব বা ফ্রিহোল্ড ল্যান্ড পাওয়া যাবে কিন্তু এখন পরিবর্তন করে বলা হচ্ছে খাজনা দিয়ে জমির বন্দোবস্ত নিতে হবে বা লিজ হোল্ড ল্যান্ড-এর ব্যবস্থা করা হবে। ইউসিআরসি-র এই সম্মেলনে কংগ্রেস সরকারের অভিসন্ধির তীব্র সমালোচনা করা হয়।[১২]

পশ্চিমবঙ্গে সেই সময়ে চরম সন্ত্রাসের পরিবেশ কায়েম করা হয়েছিল এবং শত শত বামপন্থী কর্মী সংগঠকরা নিহত হন, অথবা ঘরছাড়া হতে বাধ্য হয়েছিলেন। তার মধ্যেও গণ-আন্দোলন চলছিল। উদ্বাস্তু জনতাকে গণ-আন্দোলনের পথেই দাবি আদায়ের জন্য আহ্বান জানানো হয়। সিদ্ধার্থ শংকর রায় মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন যে মাস্টার প্ল্যান পাঠানো হয়েছিল তার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে "উদ্বাস্তু অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি বিগত বছরগুলোতে আর্থ-রাজনৈতিক অসন্তোষের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।" এই মন্তব্য থেকেই পরিষ্কার যে উদ্বাস্তু জনতার প্রতি তৎকালীন সরকার কী ধরনের মনোভাব পোষণ করত। বলাই বাহুল্য যে এই অসন্তোষ নিরসনের জন্য সরকার উদ্বাস্তু কল্যাণে অর্থ ব্যয় করার বদলে দমন-পীড়নের নীতি বেছে নিয়েছিল।

সাতের দশকের পরবর্তী পর্যায়ের আন্দোলন

সাতের দশকের শেষ লগ্নে কেন্দ্রীয় সরকার উদ্বাস্তু কলোনিগুলিতে লিজ দলিল সংশোধন করে প্রদান করার ব্যবস্থা করে। যদিও তাতেও কিছু শর্ত আরোপ করা ছিল। সংগঠনের দাবি ছিল নিঃশর্ত দলিলের এবং নতুন তালিকাভুক্ত কলোনিগুলির স্বীকৃতি প্রদান। সে কারণে লিজ দলিল প্রত্যাখ্যান করার আহ্বান সংগঠনের পক্ষ থেকে রাখা হয়। তাৎক্ষণিক সুবিধা পাওয়ার আশায় ও কিছু সংগঠন উদ্বাস্তুদের ভুল বুঝিয়ে লিজ দলিল গ্রহণ করার উদ্যোগ নেয়। কিন্তু বেশিরভাগ উদ্বাস্তু মানুষই ওই লিজ দলিল প্রত্যাখ্যান করে। আশির দশকের শুরুতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বুটা সিং পুনর্বাসনের বিষয় খতিয়ে দেখতে রাজ্যে আসেন। বিভাগীয় মন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর উদ্যোগে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের টালবাহানা দেখে রাজ্য সরকার নিজের জমিতেই স্বীকৃত কলোনির দলিল প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সে অনুযায়ী বরানগরে নেতাজি নগর কলোনিতে প্রশাসন ও সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে দ্রুত নিঃশর্ত দলিল দেওয়া হয়। চাপে পড়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী আরও কিছু কলোনির স্বীকৃতি, কলোনি উন্নয়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ-সহ নিঃশর্ত দলিল প্রদানে রাজি হন। উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে এ এক নতুন মাইলস্টোন। প্রশাসনে নতুন গতি সঞ্চার হয়। সংগঠন, কর্মচারী-সহ প্রশাসন দীর্ঘ লড়াইয়ের ফসল অর্জিত সাফল্যকে রূপায়িত করতে দ্রুত পরিকল্পনা গ্রহণ করে। নির্ধারিত সময় ধরে এই কাজ সমাপ্ত করতে গিয়ে সংগঠন তার অন্যান্য সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত ছিল না। নব্বইয়ের দশকে জমি অধিগ্রহণ ও দলিল প্রদানের সময়সীমা বৃদ্ধি, সমস্ত অনুমোদিত কলোনিগুলোর স্বীকৃতি, উন্নয়ন খাতে বাজার দর অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দের দাবি ইত্যাদি নিয়ে সংগ্রাম আন্দোলন জারি রাখে। ২৪শে আগস্ট ১৯৯৬ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ইন্দ্রজিৎ গুপ্তের সাথে উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু আলোচনা করেন। পরবর্তীকালে ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ প্রধানমন্ত্রী দেবেগৌড়ার সাথে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে বকেয়া সমস্যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু আলোচনা করেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় এই সময়কালে বামফ্রন্ট সরকারের ধারাবাহিক সাফল্য, সংগঠনের সংগ্রাম আন্দোলনগুলি জাতীয় আন্তর্জাতিক স্তর পর্যন্ত চর্চা ও গবেষণার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। ১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বীরভূমের জেলাশাসক কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সার্কুলার-এর ভিত্তিতে উদ্বাস্তু তপশিলি জাতি সম্প্রদায়ভুক্তদের সার্টিফিকেট প্রদানের অসম্মতি প্রকাশ করেন। ইউসিআরসি পক্ষ থেকে তীব্র প্রতিবাদ-সহ ওই সম্প্রদায়ভুক্ত উদ্বাস্তুদের প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়ার আবেদন জানিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলে।

দার্জিলিং জেলায় প্রোমোটারের স্বার্থে রেলদপ্তরের পক্ষ থেকে ১৮টি কলোনি ও হকারদের উচ্ছেদের বিরুদ্ধে মার্চ ২০০০ থেকে লাগাতার আন্দোলন শুরু হয়। হাওড়া রামকৃষ্ণ পল্লি ও সুভাষ পল্লি কলোনির ২২টি পরিবার তৃণমূল গুন্ডাদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার প্রতিবাদে ১৬ই এপ্রিল দাশনগরে উদ্বাস্তু জমায়েত সংগঠিত হয়। এই সময়কালে ইউসিআরসি-র পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। উদ্বাস্তুদের ভোটার লিস্টের নাম কেটে

দেওয়া, ফারাক্কার অব্যবহৃত জমিতে গড়ে ওঠা কলোনির জমি হস্তান্তর করার দাবি নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত হয়। ওই বছরই রাস্তা ও রেললাইন সম্প্রসারণের জন্য বেশ কিছু কলোনি উচ্ছেদের মুখে পড়েছিল। ইউসিআরসি-র পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণ-সহ বিকল্প পুনর্বাসনের দাবি নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত হয়। ২১ ও ২২শে মার্চ ২০০৪ মালদা ইনডোর স্টেডিয়ামে ইউসিআরসি কেন্দ্রীয় সাধারণ পরিষদের সভা থেকে কেন্দ্রের সাম্প্রদায়িক সরকার পরিবর্তনের আহ্বান জানানো হয়। ২০০৫ সালে দিল্লিতে বহির্বঙ্গের উদ্বাস্তুদের সমাবেশে আমন্ত্রিত হিসাবে ইউসিআরসি পক্ষ থেকে কান্তি বিশ্বাস উপস্থিত থেকে বাংলার বাইরের উদ্বাস্তুদের অধিকার আদায়ের আহ্বান জানান। ১৫ই ডিসেম্বর ২০০৫ মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নিকট উদ্বাস্তু সমস্যা ও দাবি সনদ নিয়ে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। ৪ঠা আগস্ট ২০০৭ ইউসিআরসি কেন্দ্রীয় পরিষদের সভায় উদ্বোধক সাধারণ সম্পাদক সমর মুখার্জি বলেন বিশ্বজুড়ে প্রতিদিনই মানুষের ন্যূনতম বেঁচে থাকার অধিকারগুলি খর্ব হচ্ছে। ভারতেও তার ব্যতিক্রম ঘটছে না। দেশের শ্রমজীবী গরিব মানুষের প্রতিনিয়ত বেঁচে থাকার অধিকার খোয়াচ্ছেন। এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। একমাত্র শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক আন্দোলনই পারে মানুষের হারানো অধিকারগুলি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে।

সপ্তদশ সম্মেলনের সম্পাদকীয় রিপোর্টে বাংলাদেশের সামরিক ও মৌলবাদী শক্তির দ্বারা গণতন্ত্রের রীতিনীতি ধূলিসাৎ করার ঘটনা, পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের শাসনকালের অগ্রগতি ও গণতন্ত্রকে কলঙ্কিত করার জন্য সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস ও মৌলবাদী শক্তির কার্যকলাপ এবং রাজ্যের নতুন শিল্প গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির চক্রান্তের কথা উল্লেখ করে অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করার জন্য গণতান্ত্রিক মানুষের সাথে উদ্বাস্তু জনগণকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে সামিল হওয়ার আবেদন জানানো হয়। আরেকটি আবেদনে কেন্দ্রে ইউপিএ সরকারের আমলে যে জনবিরোধী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পদক্ষেপগুলি সমগ্র দেশের সামনে ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে এনেছে তার বিরুদ্ধে আরও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে আহ্বান জানানো হয়। এছাড়া হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তি যেভাবে দেশের ধর্মনিরপেক্ষতার উপর আক্রমণ হেনেছে এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও সংঘর্ষ সৃষ্টির অপচেষ্টায় রত হয়েছে তার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী এবং বিশেষভাবে উদ্বাস্তুদের মধ্যে ধারাবাহিক প্রচার ও আন্দোলন গড়ে তোলার আবেদন জানানো হয়।

২৫শে আগস্ট ২০০৮ রানী রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে উদ্বাস্তুদের বিশাল সমাবেশের পর রাজ্যপাল ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বকেয়া পুনর্বাসনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে স্মারকলিপি পেশ করা হয়। ১৪-১৫ মার্চ ২০০৯ বাঁকুড়া জেলায় বড়জোড়ায় ইউসিআরসি কেন্দ্রীয় সাধারণ পরিষদের সভায় পুঁজিবাদী সংকটের বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে তোলার আহবান জানানো হয়েছিল। এই সময় পশ্চিমবঙ্গে সরকার বিরোধী শক্তি শুধু শিল্পায়নের বিরোধিতা নয়, উদ্বাস্তুদের উন্নয়ন প্রকল্পেও বাধা দিচ্ছিল। রাজ্য সরকারের উদ্বাস্তু উন্নয়ন খাতে বরাদ্দকৃত টাকায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার তালদিতে কলোনি উদ্বাস্তুদের জন্য বিদ্যুতায়নের কাজে তৎকালীন বিরোধী তৃণমূল দলের বিধায়ক বাধা দেওয়ায় ওই অর্থ ফেরত চলে যায়। পরবর্তীতে ইউসিআরসির সহযোগিতায় সেই কাজ সম্পন্ন হয়। ২০০৯ সালে কুলিয়া ট্যাংরা বাস্তুহারা কলোনির ১২৪টি বাড়ি ও ২৮টি দোকান ঘর আগুনে ভস্মীভূত হলে যৌথ রান্নাঘরে ১০০০ উদ্বাস্তু জনগণকে খাওয়ানোর ও বাসিন্দাদের জামাকাপড়-সহ সমস্ত সহায়তার জন্য বন্দোবস্ত করে ইউসিআরসি।

২০১১ নির্বাচনে রাজ্য সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর সারা রাজ্যে বিশেষ করে উদ্বাস্তু অধ্যুষিত অঞ্চলে ব্যাপক আক্রমণ নেমে আসে। সংগঠনের দপ্তর দখল, সংগঠনের কর্মীদের উপর দৈহিক আক্রমণ, বাড়িঘর ভাঙচুর, জরিমানা আদায়, ভয়-ভীতি দেখিয়ে উচ্ছেদ, পুনর্বাসনের জন্য অধিগৃহীত জমি সরকারের বিনা অনুমতিতে দখল, প্রোমোটার চক্রের আগ্রাসন ইত্যাদি শুরু হয়। ব্যাপকহারে কর্মচারী বদলি, বাজেট বরাদ্দ কমিয়ে, অপরিকল্পিত ভাবনায় পুনর্বাসনের কাজ স্তব্ধ হয়ে যায়। উদ্বাস্তু দপ্তরে ইউসিআরসি নেতৃত্বের যাতায়াত নিষিদ্ধ অলিখিত নির্দেশ জারি করা হয়। সমস্ত কলোনি কমিটিগুলোকে ও প্রশাসনের সমস্ত কমিটিগুলোকে ভেঙে দেওয়া হয়। প্রাথমিক ধাক্কা সামলে নিয়ে উদ্বাস্তু লড়াকু চেতনায় পরিপুষ্ট সংগঠন নতুন করে সংগ্রাম আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

২০১৭ সালে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অনুমোদিত দশম শ্রেণির ইতিহাসের উদ্বাস্তু সমস্যা প্রসঙ্গটিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু প্রকৃত ইতিহাসকে উহ্য রেখে, ইউসিআরসির ভূমিকাকে ইচ্ছাকৃতভাবে আড়াল করা ও বর্তমান প্রজন্মকে পুনর্বাসন আন্দোলন সম্পর্কে অন্ধকারে রাখার চেষ্টা হয়। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের সংগ্রামের ইতিহাসকে মুছে দেওয়ার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে অষ্টাদশ রাজ্য সম্মেলনে প্রতিবাদ জানানো হয়।

১৭ই সেপ্টেম্বর ২০১৭ ছিটমহল উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের অব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে সংগঠন নেতৃত্ব যান ও সুষ্ঠু পুনর্বাসনের ও নাগরিক অধিকারের দাবি জানান। ১৬ই নভেম্বর ২০১৭ সংগঠনের রাজ্যের নেতৃত্বের পক্ষ থেকে কেন্দ্র ও রাজ্যের বঞ্চনা ও উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বিরোধী রাজ্য সরকারি মনোভাবের বিরুদ্ধে এবং দপ্তর তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে বিধানসভার বামপরিষদীয় দলের নেতা সুজন চক্রবর্তীর উপস্থিতিতে প্রেস কনফারেন্স করা হয় এবং নানাবিধ আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ১৭ই নভেম্বর রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠীর নিকট উদ্বাস্তুদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের দাবি নিয়ে স্মারকলিপি পেশ করা হয়। ২৩শে নভেম্বর উদ্বাস্তুদের বকেয়া সমস্যা, ছিটমহল সমস্যা, ধর্মীয় মেরুকরণের কাজে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প অঞ্চলে ছড়ানো, দুর্নীতি, তোলাবাজির বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে কলকাতায় রানী রাসমণি অ্যাভিনিউতে বিশাল সমাবেশ করা হয়। একই দিনে শিলিগুড়ি বাঘাযতীন ক্লাবে সমাবেশ আয়োজিত হয়। ১৪ই আগস্ট ২০১৮ “আসামে নাগরিক পঞ্জিকরণ” নিয়ে এক

কনভেনশন কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল হলে অনুষ্ঠিত হয়। ওই সময়ই শিলিগুড়ি ও কোচবিহারে উদ্বাস্তু মহা মিছিল সংঘটিত হয়। ২৪শে নভেম্বর বর্ধমানে ও ২৩শে ডিসেম্বর যথাক্রমে বর্ধমান ও সোদপুরে ও অন-অনুমোদিত কলোনিগুলিকে নিয়ে কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে শিলিগুড়িতে অনুরূপভাবে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোকে নিয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৪শে জানুয়ারি ২০১৯ এনআরসি বিরোধী ও উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানে সমাবেশ হয়। ২০শে জুন ২০১৯ উদ্বাস্তু অধিকার সম্পর্কে সচেতন করতে ইউএনএইচসিআর আহূত বিশ্ব উদ্বাস্তু দিবস পালন করা হয়। এরপর থেকে প্রতি বছরই এই দিনটিকে বিক্ষোভ কর্মসূচি-সহ মর্যাদার সাথে পালন করা হচ্ছে। ১৪ই আগস্ট ২০১৮ এনআরসি বিরোধী কনভেনশন-সহ ১৩ই সেপ্টেম্বর ২০১৯ এনআরসি বিরোধী আরেকটি সমাবেশ সংঘটিত হয় এবং ২৮শে ফেব্রুয়ারি ২০২০ কলকাতা রামলীলা ময়দানে কেন্দ্রীয় জমায়েত অনুষ্ঠিত হয়।

২০২০ সালে শুরু থেকেই সারা বিশ্বজুড়ে করোনা অতিমারি আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সারাদেশেই লকডাউন ঘোষণা করা হয়। বিপাকে পড়েন গরিব খেটে খাওয়া সাধারণ উদ্বাস্তু মানুষ। এই সময় সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ায় ইউসিআরসি। কলোনি অঞ্চলে গরিব মানুষের মধ্যে রান্না করা খাবার বিতরণ, আর্থিক সাহায্য, পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ানো, রেড ভলেন্টিয়ারদের সহায়তা, শীতবস্ত্র ও ওষুধ বিতরণ, স্বাস্থ্য শিবির পরিচালনা, রক্তদান ও দেহ দান-সহ দুস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে কোচিং সেন্টার চালু করা, করোনায় আক্রান্ত পরিবারের পাশে থাকার মতো সামাজিক পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করে। মানুষের কাছে ভরসা স্থল হয়ে ওঠে সংগঠন। এই কঠিন পরিস্থিতিতে রাষ্ট্র তার যথাযথ দায়িত্ব পালন করেনি। কেন্দ্র ও রাজ্য দুই শাসক দলই সুযোগ বুঝে জনজীবনের উপর তীব্র আক্রমণ সংগঠিত করে। ১৮ই নভেম্বর '২১ জলপাইগুড়িতে আর.আর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কুলের জমি দখল করে বেআইনি নির্মাণ শুরু করে শাসকদল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। অন্যদিকে মেদিনীপুরের শালবনিতে উদ্বাস্তু আদিবাসী ১১টি পরিবারের ৮ হেক্টর জমি, শ্মশানের জমি দখল করে বেআইনি নির্মাণ চালায় মন্ত্রীর পরিবারের লোকজন। প্রতিরোধ গড়ে তুললে ১৭ জন গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে চুরি, লুটের ধারা দিয়ে মিথ্যে মামলা করে। পুলিশ প্রশাসন শাসক দলের পক্ষে দাঁড়ায়। অতিমারির সময় শিলিগুড়ির মাটিগাড়ায় ১১ নম্বর জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের জন্য ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে ইউসিআরসি ক্ষতিপূরণের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। শ্রম আইন সংশোধন ও কৃষি বিল প্রত্যাহারের দাবিতে উদ্বাস্তু কৃষি কলোনিগুলোতে প্রচার-আন্দোলন সংগঠিত করা, দিল্লির কৃষক আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের কম্বল, অর্থ বিতরণ-সহ গণ-আন্দোলন ও ধর্মঘটগুলিতে অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। উদ্বাস্তু আন্দোলনের চাপে রাজ্য সরকার নতুন করে কিছু কলোনির স্বীকৃতি এ সময়কালে দিতে বাধ্য হয়েছে। যার মধ্যে বেশিরভাগ অংশই কেন্দ্রীয় সরকারের ও ব্যক্তি মালিকানার জমি। কিন্তু জমি অধিগ্রহণ না করে উদ্বাস্তুদের অর্জিত অধিকার ক্ষুণ্ণ করে নিঃশর্ত দলিলের পরিবর্তে দখলি স্বত্বের দলিল, পর্চা দেবার কাজ শুরু করে। এর ফলে জমির মালিকদের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার ঘটনা ঘটছে। এ সময়কালে দলিল প্রাপ্ত জমি বেআইনি হস্তান্তরের কাজকে বৈধতা দিয়েছে রাজ্য সরকার। সংগঠনের পক্ষ থেকে উদ্বাস্তুদের প্রতি এই ধরনের প্রতারণার বিরুদ্ধে প্রচার আন্দোলন সংগঠিত করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী তার ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে কয়েক কোটি টাকা খরচ করে ১০ই ফেব্রুয়ারি ২০২২ নেতাজি ইনডোরে সারা রাজ্য থেকে উদ্বাস্তুদের এনে দলিল দেওয়ার ব্যবস্থা করে। ভেঙেপড়া প্রশাসনিক কাঠামো ও কর্মচারীদের উপর ক্রমাগত চাপে দিশেহারা অবস্থায় নদিয়া জেলায় একজন কর্মচারীর দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়। এই অব্যবস্থার প্রতিবাদে এবং এনআরসির জন্য নথিপত্রে নাম বিভ্রাটের আতঙ্কে কোচবিহার জেলায় আত্মহত্যার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে ইউসিআরসির পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানানো হয়। এই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও উদ্বাস্তু দাবি দিবস ও বিশ্ব উদ্বাস্তু দিবস উদ্‌যাপন, বিক্ষোভ, সভা, জমায়েত, মিছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালন করা হচ্ছে। উদ্বাস্তু মানুষের অংশগ্রহণ বাড়ছে। এ সময় কালে আরএসএসের দৌরাত্ম্যে সমাজ-সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাজনীতির আঙিনা কলুষিত হয়েছে। দেশভাগের পর ক্যাম্পে, ট্রেনে, স্টিমারে যেতে যেতে সর্বজনীনতায় ভেঙে গিয়েছিল খাদ্যাভাসের ছোঁয়াছুঁয়ি, জাতপাতের সংস্কার। কলোনিতে বিভিন্ন ধরনের জাতিবর্ণ একসাথে বসবাস, ওঠাবসা, সংগঠন সংগ্রামের তাগিদে ভেঙে গিয়েছিল ভেদ এবং সংস্কারের বেড়াজাল। বর্তমানে উদ্বাস্তু জনগণের মধ্যে নতুন করে জাতপাতের ভেদাভেদ সৃষ্টি এবং ধর্মীয় উন্মাদনা তৈরির চক্রান্তে লিপ্ত সাম্প্রদায়িক শক্তি। উদ্বাস্তুদের সাথে সমাজের অন্যান্য অংশের মানুষের বিভেদ ও দূরত্ব তৈরি করার অপচেষ্টা চলছে।

এ সময় কালে ২১শে মার্চ ২০২২ ইউসিআরসির পক্ষ থেকে বড়জোড়ায় বালি লুঠ, নদী ভাঙন ও পর্চার জন্য লাগাতার অবস্থান আন্দোলনের মাধ্যমে আধিকারিককে ডেপুটেশন গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়। ঝাড়গ্রাম জেলায় উদ্বাস্তু দপ্তর চালু করার জন্য লাগাতার আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সাফল্য আসলেও পশ্চিম বর্ধমান জেলায় এখন পর্যন্ত দপ্তর চালু হয়নি। উদ্বাস্তুরা হয়রানির শিকার হচ্ছেন। অভিজ্ঞতা মানুষের বড়ো শিক্ষক। এই সময়কালের বিভিন্ন ঘটনাবলির মধ্যে দিয়ে উদ্বাস্তু মানুষ দুই সরকারের পার্থক্য বুঝতে পারছে। তাই তারা আরও বেশি বেশি করে সংঘটিত হচ্ছে। তার প্রতিফলন দেখা যায় বিগত বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পরে কলকাতার নেতাজি নগর বাস্তুহারা সমিতির অফিস দপ্তর তৃণমূল কংগ্রেস গায়ের জোরে দখল করলে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে উদ্বাস্তু মানুষ সংঘটিত হয়ে তা দখলমুক্ত করে। নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েই ইউসিআরসি উদ্বাস্তু মানুষকে সংগঠিত করা ও তাদের স্বার্থ রক্ষা করার লড়াই জারি রেখেছে।